একজোড়া বিড়াল

পরাগ ওয়াহিদ

ভূমিপ্রকাশ

ভূমিকা

এই উপাখ্যানে একজন ডাক্তারের কথা এসেছে। তার নাম আনিসুর রহমান। কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি তার প্রতি। আমার দীর্ঘদিনের ব্যাকপেইন তার চিকিৎসায় ভালো হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ। উপন্যাসে খালাতো বোন চম্পা আপা, খালা সারাবান তহুরার কথা এসেছে কয়েক জায়গায়। সে-অংশগুলো পড়তে গিয়ে মনে হবে সম্বোধনে কিছু গণ্ডগোল রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে বিষয়টা ইচ্ছাকৃত। আমি অনেক সিনিয়রদেরকেও তুমি বলে সম্বোধন করি।

কয়েকটি স্বপ্নের বিবরণ রয়েছে বইতে। সেগুলোতে কল্পনার সংমিশ্রণ ঘটানো হয়েছে। এছাড়া প্রত্যক্ষ কিছু অভিজ্ঞতার বিবরণ দিতে গিয়ে বইতে আত্মজৈবনিক ভাব চলে এসেছে। এজন্য ক্ষমাপ্রার্থী।

প্রকাশক জাকির হোসেন ভাই এর প্রতি কৃতজ্ঞতা। বটতলার আড্ডায় তাকে এই বইয়ের পাণ্ডুলিপির কথা বলেছিলাম। তিনি ছাপাবেন বলে রাজি হয়েছিলেন।

পরাগ ওয়াহিদ
২৭ জানুয়ারি, ২০২৫
জয়নাগ রোড, বকশীবাজার, ঢাকা।

এক

রাস্তার ওপাশে থাকা মাঠে সারি সারি সাদা বিছানার চাদর শুকাতে দেওয়া হয়েছে। এটা কি আলিয়া মাদরাসার মাঠ? নাকি আশেপাশে কোনো এসাইলাম রয়েছে! ঢাকা মেডিকেলও তো এখান থেকে বেশ কিছুটা দূরে। কাদের বিছানার চাদর হতে পারে এগুলো?

ছাদের কিনারে দাঁড়িয়ে তোহা সিগারেট ধরাল। সাদা রঙের এই চাদরগুলো তোহার মস্তিষ্কে তীক্ষ্ণ বেদনাদায়ক এক স্মৃতির কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাইছে। স্মৃতিটা অনেক ছোটোবেলার। স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষা চলছে তখন। লিখিত শেষে ইংরেজি মৌখিক পরীক্ষায় 'জ্যাক এন্ড জিল' কবিতা ধরা হচ্ছে সবাইকে। হঠাৎ তোহার বাবা মটরসাইকেলে এসে তাকে এক্সাম হল থেকে নিয়ে গেল। তারপরের স্মৃতিগুলো বেশ ঘোলাটে। শুধু মনে আছে দুটি দৃশ্য। ময়মনসিংহ মেডিকেলে শুকাতে দেওয়া সাদা বিছানার চাদর আর একটি বীভৎস ধরনের ব্যান্ডেজ। তোহার মা মনিরা বেগম রোড এক্সিডেন্টে পা হারান সেদিন। সেদিনের দুটি দৃশ্য মন থেকে এখনও যায়নি।

এই দৃশ্য দুটি যে-কোনো ভাবে ভুলে যাওয়া দরকার। 'হাউ টু ফরগেট' নামে সেদিন একটি ইউটিউব ভিডিয়ো সামনে এসেছিল। ভিডিয়োটিতে কোনো ভিজ্যুয়াল নেই। ব্ল্যাক স্ক্রিনে মনোলগ চলছে। বলা হচ্ছে, মনে রাখার মতো ভুলে যাওয়াও একটা প্র্যাকটিসের বিষয় এবং এই প্র্যাক্টিস ইন্টেনশনালি করা যেতে পারে।

তোহা খানিক্ষণ চোখ বুজে রইল। এই মুহূর্তে আবহাওয়া বেশ ভালো। প্রচণ্ড বাতাস গায়ে লাগছে। তবে মুহূর্তটা শব্দহীন নয়। সামনেই একটি বিল্ডিং সংস্কারের কাজ শুরু হওয়ায় সেখান থেকে কংক্রিট ব্রেকারের মারাত্মক শব্দ ভেসে আসছে। সম্ভবত ওটা মসজিদ ছিল। আপাতত রাস্তার পাশে সবুজ টিনের বেড়া দিয়ে বানানো হয়েছে অস্থায়ী মসজিদ। এলাকায় প্রায় কাছাকাছিই দুটো মসজিদ। এই মসজিদের নাম সম্ভবত বকশিবাজার জামে মসজিদ। ওদিকে আরেকটু আগালেই চোখে পড়ে বাইতুল মা'মুর জামে মসজিদ। গত জুমা ওটাতেই পড়েছে তোহা।

শ্বশুড়ের আদেশে স্ত্রী ইলাকে নিয়ে তোহা এই বাসায় উঠেছে গতমাসে। এটা তোহার শ্বশুড় মশাই বশীর আখতাবের তিন নম্বর বাড়ি। এখানে যে বশীর সাহেবের একটা বড়ো বাড়ি আছে সেটাই তোহার কাছে অনেকদিন অজানা ছিল।

জিগাতলার বাড়িকেই শ্বশুড়বাড়ি হিসেবে জেনে এসেছে সে। দ্বিতীয় বাড়ির অবস্থান তাজমহল রোডে। ওখানে যাওয়া হয়েছে হাতে গোনা দুই একবার। থাকার জন্য জিগাতলার বাড়িটাই সবচেয়ে সুন্দর। কিন্তু বশীর আখতাব কোনো এক কারণে বছরখানেক আগে জিগাতলার বাড়ি ছেড়ে উমেশ দত্ত রোডের এ বাড়িতে উঠেছেন।

এই বাড়ির নাম 'ক্ষণিকালয়'। রং বাদামি। জানালা-বেলকনিগুলোতে রয়েছে ভিক্টোরিয়ান স্থাপত্যশৈলীর ছোঁয়া। নিচতলায় একসময় ছোটো একটা মার্কেট ছিল। এখন সেটা নেই। মার্কেট ভেঙে বিশাল গ্যারেজ করা হয়েছে। সাথে রয়েছে কর্মচারীদের জন্য থাকার কিছু রুম। বশীর সাহেব থাকেন তিন তলায়। দুই ইউনিট মিলে একটা ফ্ল্যাট বানানো হয়েছে। তোহা পরিবার সমেত থাকে চারতলায়। বাকি সব ফ্লোর ভাড়া দেওয়া। টপ ফ্লোরে পার্টি সেন্টার। ছাদে রয়েছে অসংখ্য গাছ। বাড়িওয়ালা ও তার আত্মীয়-স্বজন ব্যতীত অন্য কারো ছাদে ওঠার অনুমতি নেই।

এখানে আসার পর শ্বশুড়ের সঙ্গে তোহার কথা হয়েছে মাত্র দুইবার। প্রথমবার তিনি ডেকে বললেন, তোহা, তোমার সম্পর্কে আমার একটি অবজারভেশন রয়েছে। বলব?

তোহা মাথা নিচু করে বলল, জি আব্বা বলুন।

বশীর সাহেব সামান্য হাসি দিয়ে বললেন, তুমি হচ্ছো শিং মাছের মতো। খেতে অসাধারণ। কিন্তু ধরতে হয় ছাই দিয়ে। নয়তো তোমার দেখা পাওয়া যায় না। এদিক সেদিক ফসকে যাও।

তোহা চুপ করে রইল।

কী... উপমা পছন্দ হয়েছে?

জি আব্বা পছন্দ হয়েছে।

শুনলাম তোমার নাকি চাকরি চলে গেছে?

তোহা আমতা আমতা করে বলল, না আব্বা, চাকরি যায়নি। ছেড়ে দিয়েছি।

বলো কী! ছেড়ে দিলে কেন?

নতুন একটা কম্পানিতে জয়েন করেছি। ওরা হোম অফিস অফার করছে। মাঝে মাঝে অফিসে গিয়ে শুধু হাজিরা দিতে হবে। না গেলেও তেমন সমস্যা নেই। স্যালারিও ভালো।

বশীর আখতাব কিঞ্চিৎ হেসে বললেন, তোমরা তো দেখি উল্টা কাজকর্ম শুরু করলে। জায়া বাইরে, পতি ভেতরে।

ইলা সম্প্রতি মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরী স্কুল অ্যান্ড কলেজের বায়লোজি ডিপার্টমেন্টের টিচার হিসেবে জয়েন করেছে। প্রতিদিন ভোরে উঠতে হয় ইলাকে। অপরদিকে তোহার সকালে ওঠা নিয়ে তোমন কোনো তাড়াহুড়ো নেই। অফিস

শুরু হয় এগারোটায়। হোম অফিস চাইলে বিছানায় বসেও করা যায়।

তোহা নিচে রাস্তার দিকে তাকাল। এই রোডের নাম উমেশদত্ত রোড। রাস্তাটা কারাগারের পাশ দিয়ে উর্দু রোডে গিয়ে মিশেছে। অনেকেই উমেশদত্ত রোড আর উর্দু রোডকে একত্রে গুলিয়ে ফেলেন। তোহা নিজেও কয়েকবার কনফিউশনে পড়েছিল।

উমেশদত্ত রোড খুব একটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নয়। বাসার সামনের অবস্থা মোটামুটি খারাপ। রাস্তার একপাশে স্তূপাকারে বালি রেখে দেওয়া হয়েছে। বালির ওপাশে আবার লোকজন এসে প্রস্রাব করে। ফুটপাতের বারোটা বেজে গেছে। ভাঙাচোরা একটা ডিভাইডার রয়েছে রাস্তায়। দেখলেই অস্বস্তিবোধ হয়। এলাকার দোকানপাটগুলোও নিম্নমানের। আসেপাশে এখনও কাঁচাবাজার চোখে পড়েনি। বাজার করার প্রয়োজনও অবশ্য হয়নি এখন পর্যন্ত। শ্বশুর মশাইয়ের খাস লোক সম্রাট কয়েকদিনই পরপরই ব্যাটারি চালিত ভ্যান নিয়ে বের হয় বাজারের উদ্দেশ্যে। একসঙ্গে দুই ফ্যামিলির বাজার আনে। বাজার শেষে ধরিয়ে দেয় লম্বা কাগজের রশিদ। বিষয়টা এখন পর্যন্ত আরামেরই মনে হচ্ছে।

এই বাসার সঙ্গে স্ট্রাকচারগত কিছু মিলের কারণে শৈশবের একটা ভাড়া বাসার কথাও হালকা মনে পড়ে যাচ্ছে। বাসার নাম ছিল 'দখিনা মলয়'। তিনতলা বাসা। তোহারা তিনতলায়, বাড়িওয়ালা থাকত দোতলায়। বাড়িওয়ালার মেয়ের নাম ছিল তিন্নী। বয়সে চার-পাঁচ বছরের বড়ো হলেও শৈশবের প্রথম প্রেম বলতে তিন্নী আপু এখনও তোহার মনে কিঞ্চিৎ জায়গা দখল করে আছে। এই বিষয় কেন্দ্রিক একটি ডায়ারিও লেখা হয়েছিল। ডায়ারির শিরোনাম— জেলা স্কুলের দিনগুলোতে। নামটি তিন শব্দের না করে চার শব্দের করা যেত। শেষে 'প্রেম' শব্দটি যুক্ত করলে মন্দ হতো না। কেউ দেখে ফেললে যাতে কেলেঙ্কারি না হয় সেজন্য শব্দটি যুক্ত করা হয়নি।

ডায়ারির শেষ চ্যাপ্টারটি ছিল সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং ও ভয়ংকর। শেষ চ্যাপ্টারের পিডিএফ এখনও গুগল ড্রাইভের একটি ফোল্ডারে সংরক্ষিত রয়েছে। ফোন থেকে এখনই চাইলে পড়ে ফেলা যায়।

প্রায় বছর ছয়েক পর তোহা পিডিএফটা ওপেন করল। চ্যাপ্টারের শিরোনাম 'শেষ সকাল'।

শেষ সকাল

আমরা নতুন একটা বাসায় উঠবো। এই বাসা আমাদের ছেড়ে দিতে হবে। অনেক বছর হয়েছে আমরা এ বাসায় আছি। এখন নতুন বাসায় উঠতে খুব কষ্ট হবে। আমরা অনেক দূরে যাবো। জামালপুর। জামালপুর

আমি কখনো যাইনি। আমার স্কুলও পরিবর্তন করা হয়েছে। নতুন স্কুল আমার ভালো লাগবে না।

আজকে সকালে ঘুম থেকে উঠে আমার ভীষণ মন খারাপ হয়েছে। আব্বু সকালেই ট্রাক নিয়ে এসেছে মালপত্র নিয়ে যাওয়ার জন্য। এটাই আমাদের এই বাসায় শেষ সকাল। আমি এখন বেলকনিতে বসে আছি। একটু পরে এই টেবিলটাও নিয়ে যাওয়া হবে।

তবে, একটি কারণে আমার মন ভাল। খাটের নিচ থেকে আমার প্রিয় রুবিকস কিউব বের হয়েছে। আমি ভেবেছিলাম ওটা মাহিন চুরি করেছে। চিন্তু ও চুরি করেনি। আমি ভুল ভেবেছিলাম।

লেখার মাঝখানে আমি দোতলায় গিয়েছিলাম আন্টিকে ডাকতে। দেখি ওদের বাসায় কেউ নেই। দরজা খোলা। আমি ভেতরে ঢুকলাম। আন্টি মাঝেমধ্যে বেলকনিতে থাকে। কিন্তু বেলকনিতেও কেউ নেই। হঠাৎ আমি দেখি গোসলখানায় তিন্নী আপু গোসল করছে। ওর পুরো শরীরে কিছু নেই। আমি এত ফর্সা শরীর এর আগে কখনো দেখিনি। আমার বুক ধকধক করছে।

হঠাৎ পিঠে কারও হাতের অস্তিত্ব টের পেয়ে চমকে উঠল তোহা। পেছনে ইলা দাঁড়িয়ে আছে। সাদা শিফনের শাড়ি পরেছে ইলা। ঠোঁটে দিয়েছে কালো লিপস্টিক। কপালে কালো টিপ। চোখে কাজল।

কী ব্যাপার নিজের বউকে দেখে এত ভয় পেলে কেন?

ইলা দুই ঠোঁট শক্ত করে আছে।

তোহা কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। ইলার দিকে তাকিয়ে থাকতে ভালো লাগছে। এই মেয়ে ইদানিং পোশাক নিয়ে হুটহাট বিভিন্ন কাণ্ড করে বসছে। কবে যেন ওড়না দিয়ে মাথায় পাগড়ি বেঁধে বসে ছিল। গতকাল তোহার থ্রি কোয়ার্টার পরেই তিনতলা চারতলা করেছে। লজ্জার বিষয়। নিশ্চিত শ্বাশুড়ি আম্মার চোখ এড়ায়নি বিষয়টা। আজকে আবার পড়ন্ত বিকেলে সাদা শাড়ি পড়েছে। তবে, ড্রেস যতই অদ্ভুত হোক না কেন, এই মেয়েকে দেখতে ভালো লাগে।

তোহা স্বাভাবিকভাবে বলল, তুমি নিঃশব্দে এসে স্পর্শ করেছ তো, তাই একটু চমকে গেছি।

বাদ দাও। আমাকে এই সাদাকালো কম্বিনেশনে দেখতে কেমন লাগছে?

ইলার মুখে চাপা হাসি।

তোহা বলল, ভালো।

বাহ্! এই তোমার কমপ্লিমেন্ট!

হ্যাঁ, আর কী বলবো?

ধুর! তোমার আনরোমান্টিক হওয়ার সিজন শুরু হয়েছে বুঝতে পেরেছি। শোনো একটা জরুরি কথা আছে।

কী কথা?

আমি একটা উপন্যাস লেখা শুরু করবো ভাবছি। ধর্মীয় রিচুয়াল নিয়ে উপন্যাস। সাথে হরর আবহ। নাম হচ্ছে 'ধূসর পাহাড়'। নামটা কেমন?

তোহা কিছুক্ষণ ভেবে বলল, হুম ভালো। টাইটেলে পাহাড় সংক্রান্ত বেশ কিছু বই আছে। বিভূতিভূষণের 'চাঁদের পাহাড়' এর কথা যদি বাদও দিই ওবায়েদ হকের একটা বই আছে 'নীল পাহাড়' নামে। আহসান হাবীবের একটা বইয়ের নাম 'লাল পাহাড়'। নাম হিসেবে তোমারটাও খারাপ না। কোন ধর্ম নিয়ে লিখবে? আদম ধর্ম?

ইলা অবাক হয়ে হা করে রইল কিছুক্ষণ। এরপর বলল, আশ্চর্য! তুমি জানলে কী করে?

আন্দাজ করেছি।

ওহ্। ভাবছি হরর অংশটুকু লিখব রাতের বেলা। একেবারে গভীর রাতে। যাতে করে ভয়ের আবহ তৈরি হয়। কী বলো?

না। কোনো প্রয়োজন নেই। পরে নিজেই ভয় পাবে।

না। ভয় পাবো না। আমি এত সহজে ভয় পাই না। আচ্ছা ভালো কথা, আজকে সামিয়া আসতে পারে বাসায়। ওর জন্য কিছু আনতে হবে।

ইলার কলেজের বান্ধবী সামিয়া হক ভয়াবহ ধরনের সুন্দরী। বেশ কয়েকবছর হলো দেশীয় ওটিটি প্ল্যাটফর্মে মুভি-সিরিজ করে দর্শকপ্রিয়তা পেয়েছে প্রচুর। থাকে মেরুল বাড্ডায়। ইলার সঙ্গে মাঝেমধ্যে দেখা করতে আসে। এসে ইলার কানে ফিসফিস করে কী যেন বলে। বিষয়টা সন্দেজনক মনে হয়। তাছাড়া সেলিব্রেটি হয়েও বাড্ডার মতো জঘন্য জায়গায় কেন থাকে সেটাও এক রহস্য।

তোহা বলল, এক কাজ করি, তোমার বান্ধবীর জন্য ভালো দেখে একটা চকলেট কেক নিয়ে আসি।

হ্যাঁ, আনতে পারো। খুশি হবে।

তোমার বান্ধবী অভিনয় কিন্তু খারাপ করে না। সেদিন যেটা দেখলাম ওখানে ওর অভিনয় ভালো ছিল।

হুম, ও ইদানীং কী করছে জানো?

কী?

হিজাব পরে ঘুরে বেরাচ্ছে। শ্যুটিংয়েও যাচ্ছে না।

বলো কী? ইসলামের ছায়াতলে ফিরে এসেছে?

আরে না। কোন একটা ওয়েব সিরিজের জন্য নাকি মাথা ন্যাড়া করার প্রয়োজন হয়েছিল। এরপর থেকে হিজাব পরছে। চুল বড়ো হওয়ার আগ পর্যন্ত নো শ্যুটিং।

মুচকি হাসল তোহা। ইলা গুনগুন করে একটা গান গাইতে গাইতে ছাদের কিনারের দিকে এগিয়ে গেল। এই মুহূর্তে তোহার মনে একটা ভালো কমপ্লিমেন্টের উদয় হলো। ইলাকে সম্ভবত বিউটি উইথ ব্রেইন বলা যায়। ইলার চেহারায় তেমন কোনো বিশেষ বৈশিষ্ট্য নেই। গায়ের রং ফর্সা। একটু হলুদাভ ভাব রয়েছে। মুখে কাঁচাহলুদ মেখে কিছুক্ষণ রেখে দিলে যেরকম রং ধারণ করে ঠিক তেমন। মোটামুটি সিমেট্রিক্যাল নাক। মানানসই ঠোঁট। বিশেষ কোনো বৈশিষ্ট্য না থাকার কারণে ওর চেহারা একেক সময় একেক রকম দেখায়। স্কাউট সমাবেশে একবার আদিবাসী নৃত্য পরিবেশনের সময় রাখাইনদের মতো সেজেছিল ইলা। চোখের দৃষ্টিও উদাস উদাস। ছবিতে দেখে মনে হয় সত্যিই মেয়েটা রাখাইন। আবার ওয়েস্টার্ন ড্রেস পরলে ওকে লাগে ওয়েস্টার্ন হিরোইনদের মতো। কখনো কখনো ওর চেহারা ব্রিটিশ অভিনেত্রী 'হেইলি এটওয়েল' এর সঙ্গে অনেকখানি মিলে যায়।

ইলার সবচেয়ে মনোমুগ্ধকর বিষয়টি হচ্ছে ওর অদ্ভুত সুন্দর কণ্ঠস্বর। কথা বলার মধ্যেও একধরনের ছন্দ রয়েছে। প্রতিটি শব্দ বেশ যত্ন করে উচ্চারণ করে। ইলার থিওরিটিক্যাল নলেজ প্রচুর। কমন সেন্সের দিক থেকেও গড়পড়তার চাইতে ভালো। তবে একটু আধটু নাটকীয়তা ওর মধ্যে রয়েছে বটে। যেমন, আদম ধর্ম নিয়ে ইলা রিসার্চ করছে বেশ কিছুদিন ধরেই। 'কাজী ম্যাক'-এর লেখা একটা বই নিয়ে এসেছে। বইয়ের নামও 'আদম ধর্ম'। ভয়ংকর রকমের প্রচ্ছদ। স্বামী না হয়ে রুমমেট হলেই বিষয়টা নজরে আসার কথা। এই মুহূর্তে ধর্মীয় আচার নিয়ে উপন্যাস লিখলে সেটা যে আদম ধর্ম নিয়েই হবে এটা তোহা স্বাভাবিকভাবেই বুঝেছে। ইলার এতে আশ্চর্য হওয়ার কথা ছিল না। কিন্তু সে ইচ্ছে করে আশ্চর্য হওয়ার ভান করেছে।

ইলার দিকে আবার তাকাল তোহা। ওর চেহারায় বিশেষ কোনো বৈশিষ্ট্য নেই এটা ঠিক নয়। বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। ওর চোখ দুটো একটি আরেকটির খুব কাছাকাছি। নরমালি আরও দূরে দূরে থাকার কথা। এজন্য চশমা বা সানগ্লাস পড়লে ইলাকে কেমন যেন অদ্ভুত লাগে।

কী হলো? এভাবে তাকিয়ে আছো কেন?

কিছু না। আচ্ছা, গতরাতে কি আমি ঘুমের মধ্যে কোনো কথা বলেছি?

ইলার মুখ লাল হয়ে গেল নিমেষেই। মৃদু স্বরে বলল, হ্যাঁ বলেছ। খুব আপত্তিকর কিছু কথা। নিশ্চয়ই অশ্লীল কোনো স্বপ্ন দেখছিলে।

ইলাকে এক হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে তোহা বলল, কী স্বপ্ন দেখছিলাম সেটা মনে করতে পারছি না। আর, ঘুমের মধ্যে তো আমরা কত কিছুই বলি। আমার নানার ঘুমের মধ্যে হাত পা ছোড়ার অভ্যাস ছিল। একবার ঘুমের মধ্যে নানীকে ঘুসি মেরে দাঁত নড়িয়ে ফেলেছিলেন।

ইলা হাসতে হাসতে বলল— তখনকার মানুষগুলোই বোধ হয় অন্যরকম ছিল। আমার দাদাজানের কথা তো তোমাকে বলেছি। বিচিত্র ধরনের মানুষ ছিলেন। সবাই বলত তিনি নাকি জিনদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেন।

ছোটোসময়ে আমি একটু চঞ্চল প্রকৃতির ছিলাম। আমার প্রিয় একটা ফ্রক ছিল মেরুন রঙের। সেটা পড়ে সারাদিন দৌড়াদৌড়ি করতাম আর চিৎকার চেঁচামেচি করতাম। তখন আমরা থাকতাম লালবাগে। আমাদের বাসা থেকে কেল্লা দেখা যেত। হুটহাট ছাদে উঠে যেতাম কেল্লা দেখার জন্য। দাদাজান এসে বলতেন, ঐ যে ঐটা পরি বিবির মাজার, ঐটা হলো হাম্মাম খানা, আর এইটা হলো মসজিদ।

একদিন হুট করে কোনো কারণে শান্ত হয়ে গেলাম।

দাদাজান গম্ভীর স্বরে বললেন, ইলামনিকে জিনে আসর করেছে। ওকে আমার এখানে রেখে যা।

দাদাজানের রুমে অদ্ভুত ধরনের একটা গন্ধ ছিল। প্রথমে মনে হতো গন্ধটা পান-সুপারির। কিছুক্ষণ পরে গন্ধে পরিবর্তন আসতো এবং আস্তে আস্তে বাড়তে থাকত। এক পর্যায়ে গন্ধে নাক-মুখ সব বন্ধ হয়ে যাওয়ার অবস্থা হতো। এজন্য তার রুমে আমি যেতে চেতাম না। সেদিন আমাকে জোর করে তার রুমে নিয়ে যাওয়া হলো।

তারপর?

তারপর তার বিছানার ওপর কাসার প্লেটে সাজানো হলো নানাধরনের মিষ্টি। সাত রকমের মিষ্টি খেতে দেওয়া হলো আমাকে। কোনো একটা মিষ্টিতে নাকি দোআ পড়ে ফুঁ দেওয়া হয়েছিল। যদি আমি স্পেসিফিক সেই মিষ্টি খেতে না পারি তাহলেই ধরে নেওয়া হবে জিনের আসর সত্য।

তাই নাকি! এই ঘটনা তো আগে বলোনি। এরপর কী হলো?

এরপর আর কী! আমি সাতরকমের সাতটা মিষ্টিই খেয়ে ফেলেছিলাম।

বলো কী! এত ছোটো বয়সে সাতটা মিষ্টি খেতে পারলে?

কীজানি! সময় নিয়ে খেয়েছিলাম হয়তো। অথবা, পুরোটা খাইনি এক কামড় করে খেয়েছিলাম। কিংবা আসলেই জিনে আসর করেছিল। মিষ্টি ওরাই খেয়েছে।

তোহা মাথা নেড়ে বলল, হুম, মিষ্টি জাতীয় জিনিস জিনদের প্রিয় খবার। পুরান ঢাকার প্রেক্ষাপটে মিষ্টি বিষয়ক কিছু জিন-ভূতের গল্প শুনেছি। গভীর রাতে

নাকি তারা দোকানে মিষ্টি কিনতে আসে। এসে দোকানের লাইট বন্ধ করে দিতে বলে। এরপর একসাথে দশ-বারো কেজি মিষ্টি নিয়ে যায়। নুহাশ হুমায়ূনের মিষ্টি কিছু দেখেছ না? অসাধারণ এপিসোড। বাংলায় এর আগে আমি এত ভালো অতিপ্রাকৃত গল্পের দৃশ্যায়ন দেখিনি।

ইলা বলল, বাংলায় আরও একটা হরর সিনেমা আছে দুর্দান্ত। তোমার হয়তো মনে নেই।

তোহা ভ্রু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, কোনটা?

পরী।

পরী কোনটা যেন?

ঐ যে ইফ্রিত নিয়ে কাহিনি। আনুষ্কা থাকে, পরমব্রত থাকে।

ওহ্, হ্যাঁ। কিন্তু ওটা তো বাংলা না। হিন্দি।

ইলা বিস্ময় নিয়ে বলল, হিন্দি! সিরিয়াসলি? আমার কেন যেন মনে হচ্ছে ওটা বাংলায় দেখেছি।

তোহা বলল, এরকম মনে হওয়ার কারণ আছে। মুভির প্রেক্ষাপট সাতক্ষীরা নিয়ে। তাছাড়াও মুভিতে বাংলা বেশকিছু এলিমেন্টস ছিল। আর তুমি হিন্দিতে বেশ দক্ষ। বাংলা আর হিন্দি তোমার কাছে একই।

ইলা অন্যমনষ্ক হয়ে আবার গুনগুন করে একটা হিন্দি গান গাইতে শুরু করল। এই সময়টা রোমান্টিক আলোচনার জন্য উপযুক্ত। কিন্তু ঘুরেফিরে কেন যেন ভৌতিক আলোচনা চলে আসছে। কিছুটা রোমান্টিকতার ঘাটতি তোহার মধ্যে রয়েছে বটে। শৈশবে শাহরুখ খানের মুভি না দেখার ফল হয়তো। হাতেগোনা দুই-একটা মনে হয় দেখা হয়েছিল। তারমধ্যে একটির নাম ডন থ্রি অথবা টু। সেখানে শাহরুখ খান জেলে বন্দি থাকে। কয়েদিদের ড্রেসের রং থাকে কমলা।

রোমান্টিক কোনো উপন্যাসের কথাও মনে পড়ছে না। কী আশ্চর্য ব্যাপার!

ইলা হঠাৎ করে বলল, শাড়িতে অনেক গরম লাগছে। রুমে গিয়ে শাড়ি খুলে ফেলব। চলো।

ইলা-তোহা দুজনই রুমে চলে গেল। সন্ধ্যার দিকে বান্ধবী সামিয়া ফোন করে জানাল সে আসতে পারবে না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এরিয়ায় নাকি কিছুদিন যাবৎ ছাত্ররা রাস্তা অবরোধ করা শুরু করেছে। কর্মসূচির নাম দিয়েছে 'বাংলা ব্লকেড'। ড্রাইভার বলেছে আজকে জ্যামের কারণে শাহবাগের দিকে যাওয়া যাবে না।

দুই

বনশ্রী থেকে কুর্মিটোলার দিকে যাচ্ছি। উবার ড্রাইভার মুরুব্বি ধরনের মানুষ। গায়ে সুন্নতি লেবাস। মুখে পাতলা দাড়ি। গাড়ি স্টার্ট দিয়েই ইসলামের ইতিহাস বিষয়ক আলোচনা শুরু করেছেন। তার আলোচনা শুরু হয়েছে আদি পিতা হযরত আদম (আঃ) থেকে। ধীরে ধীরে তিনি সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। আলোচনার গতি বৃদ্ধি না করলে হয়তো মহানবী (সঃ) পর্যন্ত পৌঁছাতে পারবেন না। তার আগেই আমাদের যাত্রা শেষ হবে।

পেছনের সিটে আছে ছোটো খালা ও খালার বড়ো মেয়ে অনন্যা। আজকে অনন্যার কলেজে ভর্তি হওয়ার তারিখ। কলেজের নাম বিএএফ শাহীন কলেজ কুর্মিটোলা। আমাদের গন্তব্য সেখানেই।

আমি সামনের সিটে বসে আমার কলেজ লাইফের কথা হালকা স্মরণ করার চেষ্টা করলাম। আমার কলেজের নাম ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ। ভর্তির সময় আমাদের কলেজের প্রত্যেক ছাত্রকে একটি ইউনিক কলেজ নম্বর দেওয়া হয়, যেটা আর কোনো বর্ষের কোনো ছাত্রের সঙ্গে মেলে না। আমার কলেজ নম্বর ছিল ১৫১০৬৬১। এই নম্বরটা এত পরিমাণে কলেজে ব্যবহৃত হয় যে একসময় এটাই ডাক নামে পরিণত হয়। ক্লাস টিচার নজরুল স্যার আমাকে ডাকতেন ডবল সিক্স ওয়ান নামে।

আমাদের কলেজে বেশ বড়ো বড়ো কয়েকটি আবাসিক হল রয়েছে। হল-কে আমাদের কলেজে ডাকা হয় হাউজ নামে। ভর্তির পর আমি কাজী নজরুল ইসলাম হাউজে উঠেছিলাম। হাউজে নিয়মের অত্যন্ত কড়াকড়ি। ভোরে ঘুম থেকে উঠে মর্নিং পিটি, সারাদিন একাডেমিক ক্লাস, বিকালে স্পোর্টস, সন্ধ্যায় নামাজ, নামাজের পর খাওয়া দাওয়া, সবশেষে রাতে আবার কলেজ ড্রেস পড়ে একাডেমিক বিল্ডিংয়ে বাধ্যতামূলক নাইট ক্লাস। ভালো নিয়মের পাশাপাশি উদ্ভট কিছু নিয়মও ছিল। বৃষ্টির কারণে কোনোরাতে যদি একাডেমিক বিল্ডিংয়ে যাওয়া সম্ভব না হতো তাহলে নিজের রুমেই কলেজ ড্রেস পরিধান করে পড়তে বসতে হতো। হাউজে ফোন ব্যবহার করা ছিল কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। কলেজ এরিয়ার বাইরে যেতে হতো অনুমতি নিয়ে। সেই অনুমতি বেশিরভাগ সময়ই মিলতো না।

কিছুদিন পর এসব নিয়মে অতিষ্ট হয়ে কলেজের হাউজ ছেড়ে দিলাম। উঠলাম ফার্মেগেটের এক হোস্টেলে। সেই হোস্টেলে দেখা দিল আরেক বিপদ।

খাবারের মান তেমন ভালো ছিল না সেখানে। অনেকে বলতো সেখানকার কড়াইয়ের তেল নাকি কখনো শেষ হয় না। পোড়া তেলের মধ্যেই নতুন তেল দেওয়া হয়। হোস্টেলের খাবার খেয়ে আমার আলসার হয়ে গেল। প্রত্যেক মাসেই একবার করে ঢাকা মেডিকেলে দৌড়াতে হয়। হাই ডোজের পেইন কিলার না দিলে ব্যথা কমে না। গ্রীন লাইফ, পপুলার সহ আরও কয়েকটা মেডিকেলের ডাক্তার দেখানো হলো। হোস্টেলের খাবার না খেয়ে সুপার স্টার থেকে তিনবেলা নান রুটি আর সবজি খেতে লাগলাম। তাতেও খুব একটা লাভ হলো না। শেষমেশ গেলাম সিরাজগঞ্জের খাজা ইউনুস আলী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। লোকমুখে শুনলাম এই হাসপাতালের গ্যাস্ট্রোলজির ডাক্তার নাকি অনেক নামকরা। তবে ঝামেলার বিষয় হলো তার মেজাজ অত্যন্ত খিটখিটে। রোগীর কথাই নাকি ঠিকমতো শোনেন না। ধমকাতে শুরু করেন।

গিয়ে বুঝলাম ঘটনা সত্য। আমাকে দেখেই উনি বিকট শব্দে এক ধমক দিয়ে বললেন, খাওয়া-দাওয়া করবা না ঠিকমতো, আলসার হবে না তো কী হবে? খাবার না পেলে হাইড্রোক্লোরিক এসিড কি পাকস্থলীতে বসে কুতকুত খেলবে?

আমি মুখ ভার করে বসে রইলাম। আমার সাথে গিয়েছিলেন আব্বা আর আমার এক খালাতো ভাই। তারাও চুপচাপ বসে রইলেন। দুপুরে হাপাতালের সামনের এক হোটেল থেকে শিং মাছের তরকারি দিয়ে ভরপেট ভাত খেয়ে মন খারাপ করে বাড়িতে চলে এলাম। অবশ্য ঐ ডাক্তার দেখানোর পরে উক্ত রোগের জন্য আমার আর অন্য কোনো ডাক্তারের কাছে যাওয়ার প্রয়োজন হয়নি।

উবার ড্রাইভারের আলোচনা এখন মুসা নবী পর্যন্ত এসেছে। তিনি ওয়াজের সুরে বলছেন, মুসা নবীর রাগ ছিল অতিশয় প্রখর। থপ্পড় মারার এক সিলসিলা তার মধ্যে নিহিত ছিল। শিশু বয়সে মারলেন ফেরাউনকে। এরপর মারলেন ফেরাউনের বাবুর্চিকে। শেষ সময়ে এসে মারলেন আজরাইলকে। মেরে এক চোখ কানা করে ফেললেন। তিনি কি আজরাইলকে বিনা কারণে থাপ্পড় মেরেছেন?

আমি উত্তর দিলাম, না না। বিনা কারণে মারার তো কথা না।

ড্রাইভার সাহেব আবার বলতে লাগলেন, ঠিক বলেছেন। আজরাইল একটা ভুল করে ফেলেছিলেন। আমরা যেন তার ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করি।

আমি চোখ বন্ধ করে রইলাম। আজরাইল কী ভুল করেছিলেন সেটা ড্রাইভার সাহেব উল্লেখ করলেন না। মাঝেমধ্যেই তিনি বক্তব্যের খেই হারিয়ে ফেলছেন। অতঃপর পরিচিত কিছু কোরআনের আয়াত বলে সেই খেই সামলাবার চেষ্টা করছেন। আলোচনা খুব একটা ভালো হচ্ছে না।

শেষবার ভালো ইসলামের আলোচনা শুনেছিলাম ক্লাস এইটে থাকতে।